ধা রা বা হি ক

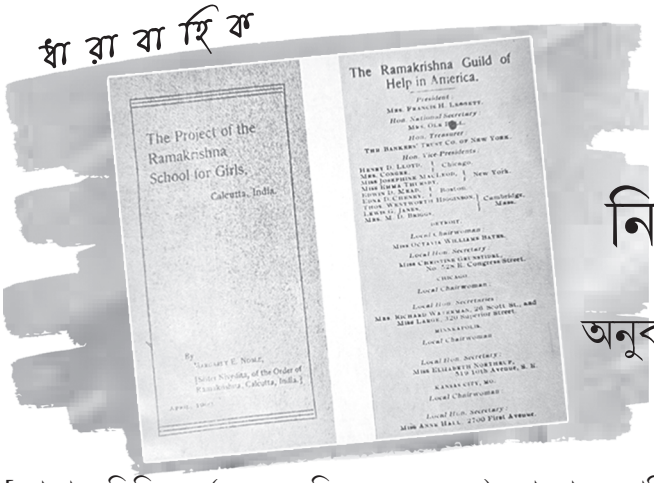
The Project of the Ramakrishna School for Girls, Calcutta, India.

The Ramakrishna Guild of Help in America.

উজ্জ্বল উদ্ধার

নিবেদিতার পত্রাবলি

অনুবাদ : প্রব্রাজিকা জ্ঞানদাপ্রাণা

[আগের কিস্তিতে (নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৩) আমরা দেখেছি, স্বামীজীর অনুরাগীদের নিয়ে গঠিত 'Ramakrishna Guild of Help in America'-র পক্ষ থেকে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয় : The Project of Ramakrishna School for Girls, Calcutta, India। তার বিষয়বস্তু নিবেদিতা লিখে দেন। পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত ভগিনীর শেষ চিঠিতে (২১ এপ্রিল ১৯০০ তারিখে মি. লেগেটকে লিখিত) আমরা পেয়েছি বইটির প্রকাশিত হওয়ার সংবাদ এবং মুদ্রণের প্রশংসা। এই সংখ্যায় রইল সেই পুস্তিকাটি।]

একটি প্রকল্প : মেয়েদের জন্য রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত।

ইংরেজ সরকার আধুনিক দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষকে যেদিন তার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বলে ঘোষণা করল, সেদিন থেকেই হিন্দুজাতির শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনগুলি পুরোপুরি পাশ্চাত্য জগতের একটি সমস্যা হয়ে উঠেছে। তার আগে সুদূর অতীত থেকে, ভারত উপমহাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান তাকে অন্যান্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। ফলে সে নিজস্ব একটি আদর্শ সমাজ গড়ে তোলার সুযোগ পেয়েছিল। ব্যক্তিমানুষের শিক্ষা যে সামাজিক পরিকাঠামোর সঙ্গে মানানসই হতে হবে—এ-ব্যাপারটি সুবিদিত ছিল।

সেকালে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার সুযোগ ছিল; যুক্তিসম্মত সুখস্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করা যেত যেটির সংজ্ঞা সাধারণভাবে স্বীকৃত ছিল। আর যে-প্রশিক্ষণ প্রত্যেক নারীপুরুষকে তার জীবন প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষেত্রে যথাযথ অনুপাতে ভাগ করে নিতে সক্ষম করে তুলত সেটিও ছিল সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

আজ এসব বদলে গেছে। ১৮৩৩ সালে বাণিজ্য বা উৎপাদন বন্ধ করার শর্তে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঘোষণাপত্রের নবীকরণ হল। অর্থাৎ কোম্পানি স্বদেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট দেশের (ভারত) শিল্প ও রপ্তানির সহায়তা ও উন্নয়ন বন্ধ করে দিল। সেদিন থেকে ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পূর্ণস্রোতে এসে পড়েছে। আর যেমন কোনও প্রাচীন মহামূল্য বস্তু বাইরের বাতাসের স্পর্শ সহ্য করতে পারে না, তেমনই সেদেশের নিজস্ব শিল্পকলা, সম্পদ ভেঙে গুঁড়িয়ে সেই স্রোতে ভেসে গেছে। সেদেশের রহস্যময় সুন্দর সুতিবস্ত্র এখনও কিনতে পাওয়া যায় ভেনিস ও

সহ সম্পাদিকা, শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশন

জেনোয়াতে; কিন্তু সেগুলি আজকাল 'পুরনো, অনেক পুরনো'। একজন বিদেশি—শাজাহানের সেই অনন্য প্রতিভা ছিল যার দ্বারা তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন সাধারণ দেশীয় ক্ষুদ্র কারুশিল্প, পাথরখোদাইয়ের কাজ দিয়ে কী না হতে পারে এবং সেটিকে কাজে পরিণত করার বদান্যতাও ছিল—তাঁর আর কোনও উত্তরসূরি নেই। প্রাচ্যের উজ্জ্বল, সুন্দর রঙের বদলে আসছে aniline রং, যেমন হিন্দুস্থানি ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি। এই ইংরেজি দেশীয় সংস্কৃত, হিন্দি ও দ্রাবিড় ভাষার সম্পদকে ইউরোপের ঊনবিংশ শতাব্দীর লঘু সাহিত্য দিয়ে প্রতিস্থাপিত করতে উদ্যত।

পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, কাম্যও। কিন্তু পরিবর্তন মানেই তো অবক্ষয় নয়। সহজেই দেখা যাচ্ছে ভারত আধুনিক বিপর্যয়ের প্রথম ধাক্কা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি; নূতন সমস্যার মূল উপাদানগুলি পর্যন্ত এখনও বুঝে উঠতে পারেনি; সমাধানের পথগুলি বার করার সময় তো আরও কম পেয়েছে। এটাও পরিষ্কার, জাতীয় জীবনে বর্তমান এই স্তব্ধতা যে পুনরুদ্ধার ও বিকাশের প্রারম্ভিক অবস্থা, বিনাশের নয়, সেটা নির্ধারিত হবে কেবলমাত্র একটি শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে; যে-পদ্ধতি দেশের মানুষের অতীতে অর্জিত সম্পদ রক্ষা করে, একইসঙ্গে আধুনিক যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম করে।

যখন তাঁতে টানা-পোড়েন চলতে থাকে তখন তাঁতির মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় থাকে না; আর তার সমাজের প্রত্যেক অংশের সহযোগিতা ছাড়া সে তার কাজ করতে পারে না। তাই যেখানেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিল্প রয়েছে সেখানেই থাকতে বাধ্য নির্দিষ্ট দর্শন শাস্ত্র ও ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে জ্ঞানের পরিকাঠামো, জাতীয় পৌরাণিক সাহিত্য, সূক্ষ্ম বিষয়গুলি সম্পর্কে অনুমান আর উন্নত মানের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের সমাবেশ। এটি ভারতের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। যেখানে অতীতে গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়গুলিতে অবদান, গুরুত্ব ও মহত্ত্বে শ্রেষ্ঠ ছিল। আবার সেরকম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই, ভারতের স্ব-অভিযোজনের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম যেকোনও শিক্ষাব্যবস্থা তার অন্যান্য ফলাফলের পাশাপাশি অবশ্যই অন্তত উচ্চবর্ণের মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করবে জাতীয়তাবোধ (জাতীয় আত্মচেতনা), নবীন জাতির প্রাণশক্তি ও দায়িত্ববোধ এবং জগতের অন্যান্য জাতিগুলির প্রতি বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার অঙ্গীকার। একটি প্রাচ্যদেশীয় জাতির যার মধ্যে প্রাচ্যদেশীয় বৈশিষ্ট্যগুলি সুস্পষ্ট থাকবে এবং তার সঙ্গে থাকবে পাশ্চাত্য জাতির মানবতা, দেশ ও দেশবাসীর সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা, পাশ্চাত্যবাসীর উদ্যোগ ও সাংগঠনিক ক্ষমতা, পাশ্চাত্যদের শক্তি ও বাস্তববোধ—এমন আদর্শ প্রাচ্য সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য আমাদের শক্তি নিয়োগ করতে হবে। (লক্ষণীয়, 'জাতীয় গৌরব সংরক্ষণ' মানে এই নয় যে অতীত-পূজারির বা বিদ্যা-অহংকারীর সূক্ষ্ম স্বার্থপরতার সঙ্গে বিগত যুগের সৌন্দর্য যথাযথ রেখে দেওয়ার চেষ্টা।)

এই লক্ষ্যে, সরকার বা অন্যদের নেওয়া পদক্ষেপগুলি বাস্তবিকই ভুল পথে না গিয়ে থাকলেও, সেগুলি কেবল প্রারম্ভিকমাত্র। তবু সেদেশের মানুষ সেসব সাগ্রহে গ্রহণ করেছে। শিক্ষাব্রতী পাদরিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ভারতবাসী কখনও ভোলে না। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী এই পেশার মহান ব্যক্তিদের নাম—তাঁরা প্রোটেস্ট্যান্ট হোন বা রোমান ক্যাথলিক—ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে রাখে। আজ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি হিন্দু ছাত্র তাদের নিজেদেরই তৈরি পরম্পরা অনুযায়ী স্কটল্যান্ডের মানুষ ডেভিড হেয়ারের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে যায়। কারণ তিনি একশো বছর আগে একটি স্কুল স্থাপন করেন যা পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়; আর কলেরা

রোগাক্রান্ত এক ছাত্রকে শুশ্রূষা করতে গিয়ে নিজে সে-রোগে মারা যান। তাঁর দেহ খ্রিস্টীয় সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করার অনুমতি পাওয়া গেল না—তাঁর যুক্তিবাদী মনোভাবের জন্য; তাই তাঁরই ছাত্ররা তাঁর দেহ বহন করে কলেজের চত্বরেই কবর তৈরি করে সমাহিত করে। হিন্দুজাতির আবেগপূর্ণ ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি বুঝতে সক্ষম এমন ব্যক্তির কাছে সেই সংক্ষিপ্ত শেষকৃত্যের প্রতিটি অঙ্গই ছিল গভীর অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। একজন অতিথিকে তাঁরই রীতিনীতি অনুযায়ী আপ্যায়ন করা ভারতের শিষ্টাচার, তার জন্য যত খরচ আর পরিশ্রম হোক না কেন! এই স্পর্শকাতর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ডেভিড হেয়ারকে কবর দেওয়ার মধ্যে পরিস্ফুট হচ্ছে, কারণ হিন্দুদের কাছে কবর দেওয়া—দাহ করার বদলে—খুবই অরুচিকর। তাছাড়া সমাজের নিম্নতম শ্রেণির ভাড়াকরা মানুষদের না দিয়ে উচ্চবর্ণের ছেলেরাই মৃতদেহ বহন করল সমাজে নিজেদের উপর বিরূপতার শঙ্কা থাকা সত্ত্বেও। এভাবে একটি ভালবাসার অভিব্যক্তিকে বিশ্লেষণ করা অমানবিক; তবু এই কাজের যথাযথ মূল্যায়ন করতে হলে আমাদের এর পিছনে সামাজিক পরিস্থিতিকে জানতে হবে। তাছাড়া মুসলমানদের মধ্যেই খুব বেশি দেখা যায় সমাধিক্ষেত্রে শ্রদ্ধা জানানো। তাই এক্ষেত্রে এটা আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ যে এই হেয়ার সাহেবের সমাধিক্ষেত্রে আজও ছাত্ররা শ্রদ্ধা জানাতে যায়; বোঝা যায় নাগরিক মনোজগতে এই ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাদূতের সম্পর্কে কত গভীর ছাপ পড়েছে।

তবে ডেভিড হেয়ার এবং অনেক মহান শিক্ষকের দিন বহুকাল আগে শেষ হয়ে গেছে। নতুন শিক্ষানীতিতে প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্য কোন প্রাচীন সাহিত্য প্রাধান্য পাবে?—এই মূল তর্কের মীমাংসা জাতীয় শিক্ষার স্বার্থে প্রশাসকদের দ্বারা হতে পারে। শেষপর্যন্ত ১৮৫৪ সালে স্যার চার্লস উডের পরিকল্পনাকে লর্ড ডালহৌসি গ্রহণ করাতে এই প্রশ্ন মীমাংসিত হল। চার্লস উডের এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্তমান সব দেশীয় বিদ্যালয়গুলি স্বীকৃতিলাভ করল, পরিদর্শিত হল আর আর্থিক সাহায্য পেল; এবং প্রাথমিক স্তরে আঞ্চলিক ভাষা ও পরবর্তী স্তরে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার মাধ্যম করা হল। সেসময় শিক্ষার প্রশ্নে এটি একটি চমৎকার সমাধান বলে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু ১৮৫৪-এর পরবর্তী বছরগুলিতে আমাদের সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে শিক্ষা কেবল শব্দগুলির ব্যাপার নয়, তথ্যগুলিরও নয়, আর এই শিক্ষার ফলাফলের বাস্তব অভিজ্ঞতা হল—যেভাবে অধিকাংশ শিক্ষাদানকার্য চলছে, ইংরেজ আধিকারিকগণ সে-ব্যাপারে পুরোপুরি অসন্তুষ্ট।

অথচ কোন্‌দিকে পরিবর্তনগুলি করতে হবে তা স্পষ্ট নয়। বঙ্গদেশে শিক্ষাদানের খরচ ছাত্রপিছু বছরে কঠোরভাবে কমিয়ে ২৯ সেন্ট বা ১ শিলিং আড়াই পেনি রাখা হয়েছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য পরীক্ষাগার বা কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থার খরচের সম্ভাবনাই নেই।

অপরদিকে যেখানে বিশাল ত্রিশ কোটি জনসংখ্যা সেখানে একবার একটা পথ বেছে নিয়ে চলতে শুরু করলে তা থেকে পিছিয়ে আসা কোনওভাবে সম্ভব নয় যদিও সে-পথের দিক পরিবর্তন করা যেতে পারে; আর তার ফলাফল যত অপ্রত্যাশিতই হোক তাকে মেনে নিতে হবে। স্যার উইলিয়াম হান্টার দেখিয়েছেন ভারতের ঐক্য সাধিত হয়েছে আধ পেনি ডাক, সস্তার রেলভ্রমণ দ্বারা আর ইংরেজি শিক্ষার জনপ্রিয়তা তাদের মধ্যে সব থেকে কম; এটি সহজেই অনুমেয় যে এ-ধরনের ঐক্য শাসক ও শাসিত দু-পক্ষেরই স্বার্থের পক্ষে কত ভয়ংকর—যা হবে কেবল সস্তা ও নীরস ইউরোপীয় সাহিত্যপাঠের মাধ্যমে।

এ পর্যন্ত যা বলা হল ছেলেদের এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। যখন

মেয়েদের কথাটি একটি পৃথক সমস্যা হিসেবে ধরি তখন আমরা নতুন বিবেচনার সম্মুখীন হই।

প্রাচ্য মহিলারা ছেলেদের তুলনায় তাঁদের রীতিনীতি ও প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি বেশি শক্ত করে ধরে রাখে। অন্যান্য দেশের প্রাচীন শাসনতন্ত্রের মেয়েদের মতো তাদের সকলকে বিবাহ করতেই হবে; তাদের ক্ষেত্রে এর পরিবর্তে চার্চের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই। আর সেই বিবাহ অল্প বয়সেই হওয়া চাই। আজকাল অবশ্য অর্থনৈতিক কারণে এই বাগ্‌দানের বয়স সাধারণভাবে বেড়ে হয়েছে বারো বছর। এই অনুষ্ঠান থেকে আন্দাজ চোদ্দো বছর বয়সে শ্বশুরবাড়ি যাওয়া পর্যন্ত সেই ছোট বধূ পর্যায়ক্রমে বাপের বাড়ি আর শ্বশুরবাড়িতে ভাগাভাগি করে বাস করে।

এইকালের মধ্যে যদি স্বামী মারা যায় মেয়েটি বিধবা হয়ে যায়। যেন সে এর মধ্যেই স্বামীর সঙ্গে থেকেছে আর সেক্ষেত্রে সামাজিক মর্যাদার কারণে পুনর্বিবাহ অসম্ভব। এসব মেয়েদের 'বালবিধবা' বলা হয়। তাদের জীবন হয়ে ওঠে সন্ন্যাসিনীর। আশা করা হয় তাঁরা সমাজে তপস্যা আর ভক্তির উচ্চ আদর্শ জীবনে বাস্তবায়িত করবেন। তার পরিবর্তে তাঁরা তাঁদের পরিজনদের সমর্থন ও মর্যাদা লাভ করে থাকেন; যেমনটি ভুলবশত ভাবা হয় তাঁদের ঘৃণা আর অবজ্ঞা করা হয়, তা নয়।

যদি সব সন্তোষজনকভাবে চলে, তবে বারো বছর বয়সের কন্যার বিবাহ হলে চোদ্দো বছর বয়সে স্ত্রীরূপে শাশুড়ির গৃহে সে কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে আসীন হয়। এর আগে পর্যন্ত সে বাপের বাড়িতে আদুরে শিশু হয়ে থাকে (হিন্দু পরিবারের ছোট মেয়েরা অতিরিক্ত আদর পায় যেহেতু তারা অল্প বয়সেই তাদের ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে; এই কারণেই এইসব ছোট মেয়েদের স্কুলে ক্লাসঘরে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়) এই সময়কালে মেয়েটির যাকে কঠোরভাবে শিক্ষা বলা হয় তা শুরু হয়। শাশুড়ির সতর্ক শিক্ষার ফল দেখা যায় হিন্দুনারীর মর্যাদাপূর্ণ আচরণ আর বুদ্ধি বিবেচনায়।

আজকের হিন্দুগৃহে অন্দরমহল আমাদের প্রাচীন দুর্গ-প্রাসাদের অন্তর্গৃহ—তুলনায় আরও সাদাসিধে আর সরল। আমাদের কন্যারা অবশ্য সূচিশিল্প, সুন্দর পর্দা ইত্যাদি বানাতে ব্যস্ত থাকে না সত্যই; কিন্তু ঘরকন্নার কাজ যেমন—ঘরদোর পরিষ্কার, রান্না, বাড়ির গরুর দুধ দোয়ানো, শিশুপালন ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকে। একটি পরিবারে সম্ভবত সমবয়সী অনেকগুলি মেয়ে থাকে যারা (কয়েকজন) ভাই ও তুতোভাইদের স্ত্রী। তারা সকলেই তাদের চেয়ে বয়সে বড় মহিলাদের সম্মান করে আর সকলের 'মা' বলে সর্বোচ্চ সম্মান পান গৃহকর্তার মা অথবা স্ত্রী। সেখানে অবশ্য কোনও প্রাচীন কবিতা বা বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনি যে আগ্রহের সঙ্গে ইউরোপীয় দুর্গপ্রাসাদের মধ্যযুগীয় মহিলারা পড়তেন তার তুলনায় ঘরকন্নার ভিতর অনেক বেশি আগ্রহের সঙ্গে ভারতীয় ইতিহাস, পুরাণ শোনা হয়। মধ্যযুগীয় দুর্গপ্রাসাদে যেমন ভবঘুরে চারণ গাইত আর অভিনয় করত, সেরকম বসন্তকালের সন্ধ্যাবেলা রামায়ণ গান বা কথকতার দল এসে বাড়ির উঠানে আসর জমায়। আর মহিলারা বারান্দায় পর্দার আড়ালে বসে যাতে অন্য কেউ তাদের দেখতে না পায়, সেই চির পুরাতন, চির নবীন রামায়ণ কাহিনি, রামসীতার বনবাসের কাহিনি শোনেন।

এরকম সরল আনন্দ উপভোগের সুযোগ ক্রমশ কমে আসছে; কারণ এরকম কথকতার আয়োজন করতে যে সামান্য খরচ তাও বহন করার ক্ষমতা বছরের পর বছর কমেই আসছে। ভারতীয় উচ্চবর্ণের ছেলেরা ক্রমশ সস্তা ইংরেজ কেরানির দলে পর্যবসিত হচ্ছে আর ক্রমাগত তাদের বহু সংখ্যক পোষ্যদের ভরণপোষণে অসমর্থ হয়ে পড়ছে। এই অবস্থা থেকে উঠে আসতে হলে উদ্যম

ও সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি নিয়োগ করে নতুন নতুন কর্মপথ খুলে নিতে হবে। আর এইরকম পুনর্গঠনের যুগে মহিলাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা সামাজিক শক্তি হিসাবে একান্ত প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াবে।

এটি স্পষ্ট যে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা প্রধানত নিয়মশৃঙ্খলার শিক্ষা, বিকাশের নয়। তবু সে শিক্ষা মহান ব্যক্তিদের আবির্ভাবকে ব্যাহত করতে পারেনি। এরকম বহুজনের মধ্যে লক্ষ করুন—সেই বিধবা ঝাঁসির রানি—সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাঁর নিরালাস্থান থেকে বেরিয়ে এসে রাজ আদেশ ঘোষণা করা, নূতন মুদ্রা প্রচলন করা, কামান ছোঁড়া, আর শেষে নিজের সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের (ব্রিটিশ) সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ দিলেন।

এধরণের বিক্ষিপ্ত উদাহরণগুলি এই জাতির ভিতরের শক্তিকে দেখাতে সাহায্য করে; তাদের শিক্ষাব্যবস্থার যথার্থতা বা তাকে নির্ভুল প্রমাণ করার জন্য নয়। এটি অনস্বীকার্য যে আমরা যদি ভারতীয় নারীদের বর্তমান জীবনে ব্যক্তিত্ব বিকাশের বিস্তৃতক্ষেত্র খুলে দিতে পারি, বৃহত্তর সামাজিক সম্ভাবনা আর কিছু আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের ক্ষমতা—বর্তমান নীতি নিয়মের কোনও বিরূপ সমালোচনা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে না করে—তাহলে আমরা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু সাধিত করতে পারব।

এখন, খ্রিস্টান মিশনারি এবং অন্যান্যদের প্রচেষ্টার কল্যাণে কয়েকজনের নাগালে এসেছে দুইরকম শিক্ষাব্যবস্থা—প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অক্ষর পরিচয় (প্রারম্ভিক শিক্ষা) আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি। যেহেতু রক্ষণশীল পরিবার তাদের মেয়েদের বিবাহের পর পর্দানসীন করে দেয়, তাদের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়শিক্ষা দশ কী বারো বছর বয়সে বন্ধ হয়ে যায়। খ্রিস্টান, ব্রাহ্ম বা পার্সিদের ক্ষেত্রে মেয়েরা অনায়াসেই অনেকেই ডিগ্রি অর্জন করে।

কিন্তু এগুলিই এবং এর মতো উদাহরণগুলি যদি বিবেচনা করি বঙ্গদেশে মোট মেয়েদের সংখ্যার নিরিখে কেবল সাড়ে ছয় শতাংশ প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী শিক্ষা পায়; আর বাংলাকে এ-ব্যাপারে দেশে উন্নততম রাজ্য বলা হয়।

তাই এর জন্য একটি বিরাট চাহিদা আছে। আমরাও এ-ব্যাপারের মীমাংসায় কিছুটা একমত। প্রশ্ন হচ্ছে, কীভাবে, কোথায় আমরা ভারতীয় মেয়েদের এমন একটি শিক্ষাদানের কাজ আরম্ভ করব যা তাদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উন্নয়ন বা বিকাশ ঘটাবে।

এসব তথ্যগুলির সতর্ক বিচার, বিবেচনা করেই এই মেয়েদের জন্য রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

আমরা মনস্থ করেছি, যদি প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে পারি, কলকাতার কাছেই গঙ্গার তীরে একটি বাড়ি ও জমি ক্রয় করে, সেখানে কুড়ি জনের মতো বিধবা আর কুড়ি জন অনাথ মেয়েদের নেওয়া হবে। পুরো দলটি থাকবে সারদা দেবীর তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায়। এই সারদা দেবীর নাম সম্প্রতি প্রফেসর ম্যাক্সমুলার জগৎবাসীর কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন 'রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী' গ্রন্থের মাধ্যমে।

আরও প্রস্তাব করা হচ্ছে এর সঙ্গে একটি শিক্ষাকেন্দ্র থাকবে যেখানে হস্তশিল্পে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া যাবে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষা হবে কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে। এর মধ্যে থাকবে ইংরেজি আর বাংলাভাষা আর সাহিত্য, প্রাথমিক স্তরের গণিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়ানো হবে আর পড়ানো হবে কিছু প্রাথমিক স্তরের বিজ্ঞান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে! আর প্রাচীন ভারতীয় শিল্প পুনরুদ্ধারের কথা মাথায় রেখে হস্তশিল্পও শেখানো হবে। শেষোক্ত বিষয়টি জরুরি এই কারণে যে ছাত্রী নিজের গৃহের বাইরে না গিয়ে নিজের জীবিকা উপার্জনে সক্ষম হবে, এমন একটা বৃত্তির

দ্বারা যা তার আভিজাত্য বজায় রাখবে।

কিন্তু এই বিদ্যালয়ের একটি দ্বিতীয় কাজ আছে। বিধবা, যারা ধরে নিতে পারি আঠারো-কুড়ি বছর বয়সের মধ্যে থাকবে, তারা কেবল জায়গাটিকে যথার্থ হিন্দু গৃহজীবনের পরিবেশ দান করবে তা-ই নয়, তাদের মধ্যে আমরা আশা করছি দু-তিনটি শিল্প গড়ে তুলতে যাদের বাজার পাওয়া যাবে ইংল্যান্ড, ভারত ও আমেরিকায়। এগুলির মধ্যে থাকবে দেশি জ্যাম, আচার, চাটনি ইত্যাদি তৈরি।

যদি আমাদের এই প্রচেষ্টা সবদিক দিয়ে সার্থক হয়—যদি সর্বোপরি এটি হিন্দু সমাজের গ্রহণযোগ্য হয়—কোনওভাবে বিজাতীয় না হয়—এটি সম্ভব হতে পারে কিছুদিন বাদে আমরা প্রত্যেকটি বালিকাকে বলতে পারব নিজের জন্য বেছে নিতে বিবাহিত জীবন অথবা দেশসেবায় জীবন উৎসর্গ। যারা প্রথমটি বেছে নেবে আমরা আশা করব তাদের সম্মানজনক উপায় ও উপকরণ জোগাতে পারব। যে কেউ তার সমগ্র জীবন স্বদেশ আর নারীজাতির জন্য বিরামহীন সেবায় উৎসর্গ করতে চাইবে আমরা আশা করব তাদের আরও বাড়তি শিক্ষা দিয়ে বয়স্কা মহিলাদের তত্ত্বাবধানে আর নিরাপদ আশ্রয়ে অন্যান্য কেন্দ্রগুলিতে নূতন নূতন রামকৃষ্ণ স্কুল খুলতে। এই হল সংক্ষেপে আমাদের পরিকল্পনা।

এইটি কার্যকরী করতে যথাযথ ব্যবস্থা আর তার সঙ্গে পাশ্চাত্য দক্ষ শিক্ষিকাদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও মাহিনা বাবদ—সব মিলিয়ে ত্রিশ হাজার ডলার প্রয়োজন হবে। এছাড়া বাৎসরিক খরচ পড়বে তিন হাজার ডলার। এই তহবিলে এর মধ্যে পনেরোশো ডলারের কিছু কম সংগৃহীত হয়েছে; তার মধ্যে নিউইয়র্কের মিসেস ফ্রান্সিস লেগেটের দান এক হাজার ডলার।

অবশ্য বলার প্রয়োজন নেই যে এ-অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে তোলার জন্য যেকোনও পরিমাণের—কম বা বেশি দান বা চাঁদা সাদরে গৃহীত হবে আর তা কাজে লাগবে। নিউইয়র্কের ১০ নং ওয়াল স্ট্রিটস্থ The Banker's Trust Company এগুলি গ্রহণ করে আমার নামে জমা রাখতে সম্মত হয়েছেন। আশা করছি সমস্ত দান আমাদের গোষ্ঠীর সকলের অবগতিতে রাখব। সমস্ত দানের রসিদ, হিসাব আর বইপত্র যা প্রকাশিত হবে সব তাদের সোজাসুজি পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

চাঁদা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যাঁরা বিভিন্ন জায়গায় আমাদের সঙ্ঘের শাখাদল গঠন করার উদ্যোগ নেবেন তাঁরা সকলেই ধন্যবাদার্হ। তাঁদের ক্ষেত্রে তাঁদেরই মাধ্যমে Banker's Trust Company-তে অর্থ জমা পড়বে; কিন্তু রসিদ আর হিসাব আমার কাছ থেকে সোজা দাতাদের কাছে চলে যাবে। সুতরাং স্থানীয় সম্পাদকদের কর্তব্য হবে তিনরকম—১। দান বা চাঁদা দিতে স্বীকৃত হয়েছেন যাঁরা তাঁদের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ করা। ২। সেই অর্থ Banker's Trust Company নিউইয়র্কে জমা দেওয়া। ৩। দাতাদের সকলের নাম ঠিকানা সোজা Ramakrishna School, Calcutta, India ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া অথবা সেই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগে পর্যন্ত Miss Noble c/o Francis H Leggett, Esq, 21 West 34th street, New York এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

পরিশেষে বলি, আমি বিশ্বাস করি আমি কোনও শক্তি বা দান হাতের কাছে যা কর্তব্য তা থেকে দূর ভবিষ্যতের কোনও কাজের জন্য সরাতে চাই না। আধুনিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থনীতির যুগে আমরা নিশ্চিতভাবে অনুভব করি কেবল জগতের সেবাই যথার্থ স্বদেশ সেবা। Walt Whitman-এর সেই মহত্তম প্রশ্ন—সব জাতি কি পরস্পর ভাব বিনিময় করছে? সমগ্র জগতের একটিই হৃদয় হতে চলেছে? মনে হয় আমরা ইতিমধ্যেই এই প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দিচ্ছি।

মার্গারেট ই নোব্‌ল,

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সিস্টার নিবেদিতা,
কলকাতা, ভারতবর্ষ।
প্রযত্নে—Francis H Leggett, Esq,
21 West 34th street,
New York City. N.Y.

কিছু প্রশ্ন যার উত্তর মিস নোব্‌ল দিয়েছেন।

প্রঃ ১) আপনি কি আপনার দেশ ও জাতি পরিত্যাগ করেছেন?

উঃ নিশ্চয়ই নয়, কেন করব? (আমি ইংরেজ মহিলা হওয়ার দরুন ভারতের জন্য কাজ করবার এর চেয়ে জোরালো উদ্দেশ্য কী থাকতে পারে?)

প্রঃ ২) আপনি কি খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করেছেন?

উঃ না, আমি অনেকবার বলেছি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যে তিনজন খ্রিস্টান সদস্য এখন ভারতে বাস করছেন তাদের মধ্যে আমি একজন। বাকি দুজন (ইংরেজ সৈন্য) ক্যাপ্টেন সেভিয়ার ও তাঁর পত্নী।

প্রঃ ৩) আপনি কি একটি আধ্যাত্মিক জীবনে বিশ্বাস করেন না? মানে ইহজীবনে ঈশ্বরের Holy Spirit-এর প্রত্যক্ষ প্রভাব ও সাহায্য?

উঃ আমি বিশ্বাস করি একমাত্র এই Holy Spirit-এর প্রভাব ও সাহায্যই জীবন। এর নিরবচ্ছিন্ন ক্রমোন্নত অনুভূতি ছাড়া জীবন মিথ্যা।

প্রঃ ৪) ভারতে স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী?

উঃ রক্ষণশীল হিন্দু বালিকাদের এমনভাবে শিক্ষাদান—শুধু পড়ানো নয়, যা দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী হবে। যদি কোনও ভারতীয় নীতি-নিয়ম ভুল হয়ে থাকে, ভারতীয়দেরই তাকে পরিবর্তন করার অধিকার আছে। আমাদের লক্ষ্য হবে কেবল তাদের মধ্যে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা জাগানো আর তাকে কার্যকরী করার শক্তি গড়ে তোলা। এও ভাবছি, কোনও ভারতীয় নারীকে সরাসরি সুযোগ করে দিতে হবে যাতে সে সামাজিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে নিজের জীবিকা উপার্জনে সক্ষম হবে।

প্রঃ ৫) কোন শ্রেণীর মেয়েদের পড়ানো হবে?

উঃ দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের প্রথম চেষ্টা হবে উচ্চবর্ণের দিকে। আমি আশা করছি শেষ পর্যন্ত সব্বাইয়ের কাছে পৌঁছতে পারব; খানিকটা যে-হিন্দু মেয়েরা সমাজের বিভিন্নদিকে বিশেষ অধ্যয়নে আগ্রহী তাদের মাধ্যমে।

প্রঃ ৬) সেগুলি কেবল শিক্ষাদানের স্কুল, না?

উঃ এর মানে কী? আমি কাউকেই খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করতে চাই না। কোনও খ্রিস্টানকে অন্য কোনও ধর্মে পরিবর্তিত করা নয়। কোনও মুসলমানকে হিন্দু বা খ্রিস্টান করা নয়। এটি কি সঠিক উত্তর হল?

প্রঃ ৭) সেই স্কুলগুলি কী শেখাবে?

উঃ ১, ২. বাংলা ও ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য, ৩. প্রাথমিক স্তরে অঙ্ক (খুব ভাল করে), ৪. কোনও একটি প্রাথমিক বিজ্ঞান (পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে)। ৫. হাতের কাজে প্রশিক্ষণ, প্রথমে শিশু শ্রেণী থেকে—পরে প্রাচীন ভারতীয় শিল্প পুনরুদ্ধারের ক্ষমতার্জন পর্যন্ত। ৫. নম্বরটাই এই পরিকল্পনার মেরুদণ্ডস্বরূপ।

প্রঃ ৮) এইটি আপনার একটি লোকহিতকারী অভিপ্রায় নয়? অসহায়কে, অভাবীকে সাহায্য করা জাতি নির্বিশেষে? আর কোনও ধর্মমত প্রচার নয়?

উঃ আমি আশা করছি তাই। কিন্তু আমি প্রত্যেককেই শেখাতে চাইব, অপরের ধর্মকে সম্মান করতে। মনে হয়, এই গুণ আমাদের নিজেদের যতটা প্রয়োজন অন্যদের তা নয়। ভারতে আমার বন্ধুরা আমাকে ভালবাসে আমার খ্রিস্টধর্মের প্রতি ভালবাসার জন্য, আর সে সম্পর্কে আমার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করে। আমরা সেরকম মিষ্ট ব্যবহার ও ভদ্রতা দেখাতে পারি না?

Margaret E. Noble
April 2nd, 1900